আটকে পড়া বিহারি : বিহার যাদের জোটেনি

অবনি অনার্য

তথ্যমতে বাংলাদেশে তেরোটা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের ৬৬টা ক্যাম্পে এখনও আড়াই লাখ থেকে তিন লাখের মতো আটকে পড়া বিহারি আছে। আটকে পড়া পাকিস্তানিই বলা হয় এদেরকে। জন্মসূত্রে এরা কিন্তু পাকিস্তানি নয়, ভারতীয়। আঞ্চলিক বিচারে এদের জন্ম ভারতের বিহার রাজ্যে; এর উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে উত্তর প্রদেশ, দক্ষিণে ঝাড়খণ্ড আর পুবে পশ্চিম বঙ্গ। বৌদ্ধ আর জৈন ধর্মের জন্মভুমি এই বিহার হলেও, ঐতিহ্যগতভাবে বিহার রাজ্য হিন্দু সংস্কৃতি প্রধান। ফলে, ১৯৪৭-এর ভারত বিভাজনের প্রাক্কালে এ-অঞ্চলের উর্দু ভাষাভাষি মুসলিম সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে চলে আসে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে। এক প্রজন্ম পার না হতেই পাকিস্তানের বিভাজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়, এবং '৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে পুর্ব পাকিস্তান হয়ে যায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এসব বিহারিরা পশ্চিম পাকিস্তানকে সমর্থন করে, বিশেষত ভাষা এবং ধর্মের কারণে। বিপুল সংখ্যক বিহারি রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি এদেশি পাকিস্তান সমর্থক গোষ্ঠির সঙ্গে অথবা সরাসরি পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা নিধনসহ স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। অন্যান্যরা সাধারণ বাঙালির মতোই নিরপেক্ষ ভুমিকা পালন করে। অর্থাৎ, দেখা যায়, তারা এদেশের মানুষের মতোই। আমাদের বাঙালিদেরই একদল অবিশ্বাস্য দেশপ্রেমিক উৎসর্গ করেছে নিজেদের মুক্তিযুদ্ধে, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধা; একদল ঠিক তার বিপরীত, স্বাধীনতা বিরোধী, এরা রাজাকার; বাকিদের অনেকেই, এমনকি এখন অনেক বড় মাপের বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক, সাহিত্যিক ইত্যাদি ছিলেন, যারা না মুক্তিযোদ্ধা, না রাজাকার– এক কথায়, এরা নপুংসক।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিজয়ে বাঙালি নেচেছে, কেঁদেছে অসংখ্য প্রিয় হারানোর বেদনায়, ক্রুদ্ধ হয়েছে রাজাকার, আল বদর আর এসব বিহারিদের দেখে। স্বাভাবিকভাবেই, এদেরকে এদেশে রাখার ব্যাপারে বাংলাদেশ কোনো দায় বোধ করেনি, কেননা, এরা বাঙালি নয়, উপরন্তু কাজ করেছে পাকিস্তানিদের পক্ষে। ওদিকে, পাকিস্তানিরা নিজেদের লেজ গুটিয়ে নিতেই ব্যস্, উপরন্তু স্বার্থপর কিছিমের। কোনো ভাবেই পাকিস্তান সরকার এদের আর ফিরিয়ে নিতে চাইলো না। কাজের কাজ যা হলো, এরা বাংলাদেশে থাকতে বাধ্য হলো, যদিও তারা পাকিস্তানেই ফিরে যেতে চেয়েছিলো। নিতান্ত মানবেতর জীবন যাপন। আন্তর্জাতিক রিফিউজি আইন মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার এদেরকে রেশন দিতে বাধ্য হলো। কিন্তু বস্, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার মতো অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলোর অবস্থা ক্রমাগত তথৈবচ। দীর্ঘ ৩৪ বছর সময়েও এ-সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি।
বাংলাদেশ থেকে বলা হয়েছে, জাতিসংঘ, জাতিসংঘের রিফিউজি বিষয়ক হাই কমিশনারসহ বিশ্বব্যাপি বেসরকারি অনেক মানবাধিকার সংগঠন থেকে ক্রমাগত চাপ দিয়েও পাকিস্তানকে দিয়ে এ-কাজটি করানো সম্ভব হয়নি। অথচ, বার্মার রোহিঙ্গা শরনার্থীর সংখ্যাও ছিলো আড়াই লাখের মতো, দুদেশের সহযোগিতায় পরিসংখ্যান মতে সে সংখ্যা এখন কুড়ি হাজারেরও কম। কৃতিত্বের সিংহভাগ অবশ্যই বার্মার।

কিছু সংখ্যক বিহারিকে পাকিস্তান নিয়েছে বটে, তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাড়ির সদস্যদের মধ্যে ঘটেছে বিভাজন– বাবা মা গেছে তো ছেলে মেয়ে পড়ে আছে, অথবা উল্টোটা। প্রথম দিকে, বাবা মা হয়তো তার ছেলে মেয়েকে পাঠাতে রাজি হয়নি; তাদেরকে বলা হয়েছে কদিন বাদেই সবাইকে নিয়ে যাওয়া

হবে। সেটা আর কখনোই হয়ে ওঠেনি। ওরা আন্দোলন করেছে, ফল হয়েছে শ্রীঘর ভ্রমণ। এবারও আবার আমরণ অনশন করছে, লাভ তো কিছু হবে বলে মনে হ"ছে না। আমরণ অনশনের মতো মানবিক আন্দোলন উপলব্ধি করার মতো হৃদয় যদি শাসক গোষ্ঠির না থাকে, তাহলে বৃথাই সব। সমতলে জুমচাষ হয় না।
ক্যাম্পগুলোর অবস্থা বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। সবাই কম বেশি জানেন। ঘিঞ্জি আবাসন থেকে শুর" করে, পানি পয়ঃনিষ্কাষণ ইত্যাদি সমস্যার পাশাপাশি খুবই উদ্বেগের বিষয় হ"ছে যৌথ জীবন। কোনো প্রাইভেসি নেই বলে অনেক ছেলেই নিজেদের মধ্যে বিবাহে আগ্রহী নয়, তারা সম্ভব হলে বাংলাদেশি কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধছে। ফলে বাড়ছে বিহারি অবিবাহিত মেয়ের সংখ্যা– পরিসংখ্যান মতে, এ সংখ্যা কুড়ি হাজারেরও বেশি। এ পরিসংখ্যান কেবল পরিসংখ্যানবিদ বা মানবাধিকার সংগঠন জানে এমন নয়, জানে পতিতার দালালরাও। এদের দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবদ্ধ এইসব ক্যাম্পের দিকে।

এবার একটা সম্ভাব্য সমাধানের পথ ভাবা যায়। নিরপেক্ষ বিচারে বাংলাদেশের দায়িত্ব নিজে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা যেমন, জাতিসংঘ, ইউনাইটেড ন্যাশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সহযোগিতায় এদেরকে ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তানকে বাধ্য করা। অনতিবিলম্বে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। এবার বাংলাদেশের দায়ের পালা। বিহারিদের নতুন প্রজন্ম জন্মেই দেখেছে বাংলাদেশ। ভালো হোক, মন্দ হোক, অন্যান্য বস্তিবাসির মতো জন্মভুমিই এদের অধিকাংশের কাছে ইপ্সিত। জন্মভুমির বাইরে অন্য কোনো দেশের প্রতি আগের প্রজন্মের মতো গোঁড়া কোনো টান এদের নেই। এদের টানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বাংলাদেশ এদেরকে নাগরিকত্ব দিতে পারে। ২০০৩ সালে মহামান্য হাই কোর্ট ১০ জন বিহারিকে বংলাদেশি নাগরিকত্ব প্রদান করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সেটা চালিয়ে যেতে পারে। বড় বড় রাজাকার আলবদর কমাণ্ডার যদি ছাড় পেয়ে, নাগরিকত্ব পেয়ে, মন্ত্রিত্ব পেয়ে পতাকা উড়িয়ে ঘুরতে পারে, তাহলে বিহারিদের মধ্যে যারা সত্যিকার অর্থে এদেশে থাকতে চায় তাদেরকে বাংলাদেশ এ-ক্ষমাটুকু করতে পারে। স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষমা করা নিয়ে বিতর্ক আছে, আরো একবার ক্ষমার সে মহত্ব বা ক্ষমার অন্যায়টুকু করা যায় কি-না ভেবে দেখা যেতে পারে।
নতুন যে বিষয়টা বলতে চাই সেটা হ"ছে, জন্মগতভাবে বিহারিরা যেহেতু ভারতীয়, তাই বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের বাইরে ভারতের কোনো দায়ভার আছে কি-না, এ-বিষয় নিয়ে একটা খুবই গুর"ত্বপুর্ণ আলোচনা হতে পারে বলে মনে হয়।

কারো আবেগ, কারো একগুঁয়েমি আর কারো উন্মাসিকতায় অন্য একজনের চরম ভোগান্তির কী অর্থ আছে? এদের জন্ম বিহারে। বিহার শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বিহারা' থেকে, যার একটা অর্থ 'আবাসন', অন্য অর্থে 'বিচরণশীল'। ইতিহাসের কী নির্মমতা, বিহারে জন্ম নিয়ে সেই বিহারিদেরই আজ কোনো নির্দিষ্ট 'বিহার' জোটেনি, কেবল 'বিহারি' তথা 'বিচরণশীল'-ই হয়ে থাকলো তারা!